পরিক্রমা

বিশ্বপুরুষ

স্বামীজীর একশো পঞ্চাশ বছর ঘুরে ঘুরে আমাদের সামনে বহু পরিকল্পনার কথা শুনিয়ে গেল। কত প্রতিজ্ঞা, কত সংকল্প মনের পটে ভেসে উঠল একে একে। বিবেকবাণীতে অভিজ্ঞাত আমরা। তবু তাকিয়ে আছি আগামী কল্পতরুর দিনটির দিকে যেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশিস ঝরে পড়বে—'তোমাদের চৈতন্য হোক'। ওই আশিসের সঙ্গেই স্বামীজীর মহাবাণী সংপৃক্ত। স্বামীজী বললেন, 'ওঠো জাগো'। রামকৃষ্ণ-কল্পতরু থেকে অর্থসম্পদ, মণিমুক্তো ঝরেনি। ঝরেছে ত্যাগের মহামন্ত্র, নরনারায়ণের সেবামন্ত্র।

সেই আশিস যার মাথায় ঝরেছে তার নবজন্ম লাভ হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানগণ তাঁর সেবাকেই প্রাধান্য দিয়ে ওই দিব্যদিনের আশীর্বাদ গ্রহণ করতে উদ্বেল হননি। তাঁরা দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে কী অদ্ভুত উল্লাসে ভক্তপ্রাণে জোয়ার ডেকেছিল। সকলকেই সেই আনন্দের ভাগীদার করতে তাঁরা ব্যাকুল। ঈশ্বরীয় আনন্দে তাঁরা মত্ত। হয়তো স্বামীজী উপস্থিত থাকলেও এগিয়ে আসতেন না ওই দিব্যমকরন্দ আস্বাদনে। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণময়, তদ্‌ভাবভাবিত ও পূর্ণ ছিলেন।

এত দীর্ঘ ব্যবধানেও ওই কল্পতরুর দিনটি মানুষের মনে প্রেরণাসঞ্চারী হয়ে আছে এবং দিন দিন সে-আশীর্বাদের অমোঘ প্রভাব মানুষকে রূপান্তরিত করে চলেছে।

আমাদের মানসপটে উজ্জ্বল রয়েছে আর একটি ছবি। সেদিন মহাচৈতন্য ঝরেছিল দিব্যধারায় পার্ষদবর্গের শিরে। আঁটপুরে পল্লির নিস্তব্ধতায় আকাশের নিচে জড়ো হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ অন্তরঙ্গ ত্যাগী ভক্তবৃন্দ। সেদিন তাঁদের অন্তরের সুপ্ত বৈরাগ্যানল বাইরে ধুনির রূপ নিয়েছিল। তাঁরা ধ্যানস্থ। মন তাঁদের হোমাপাখির মতো ডানা মেলেছিল অসীমে।

ঠিক এই সময়ে স্বামীজীর মন দেশ-কালের পর্দা সরিয়ে ভাসমান হয়েছে ভগবান যিশুর অপূর্ব জীবনাকাশে। তিনিও সেদিন অটুট সংকল্পে ভরা রক্তের রেখায় আঁকা যিশুর ত্যাগী পার্ষদদের যেন নতুন করে দেখলেন। কত যন্ত্রণা, কত নির্যাতন! তারই মধ্যে বহন করছেন 'ক্রুশ' যা অবতারের যাতনার প্রতীক। সকলের মাথা গোঁজার স্থান আছে, নেই শুধু ঈশ্বরপুত্রের। নেকড়ের দলে নিরীহ মেষশাবকের মতো তাঁর জীবন যেন নিষ্ঠুর, নির্মম মানুষের হাতে সমর্পিত। তারা অমৃতের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিল বিষবোধে।

স্বামীজীর ধ্যানের পটে সেদিন কত কথা ফুটেছিল আমরা জানি না। শুধু জানি তিনি কোন এক প্রেরণায় উঠে দাঁড়ালেন পার্ষদদের নিয়ে। চোখে-মুখে তাঁদের দুই মেরু ধরে নাড়া দেওয়ার অটুট সংকল্প। মহাচৈতন্য কুণ্ডলিনীশক্তি ফণা মেলে দাঁড়াল সংকল্পের রূপ দিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণীর প্রবাহ তাঁরা অন্তরে ধারণ করেছেন কিন্তু ঘর-সংসার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ না করলে ওই বাণী বিতরণের অধিকার আসবে না, তাই মহাত্যাগের সংকল্প করলেন সমবেতভাবে। ত্যাগের পতাকা নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের জয়যাত্রা শুরু করতে হবে।

মহাসাধনার ধুনি জ্বালিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে, বটতলায়, বেলতলায়। সে-আগুন ধারণ নিজের দেবতনুতে। কলকাতার মানুষ তার আঁচ পেয়ে গঙ্গাতীরের ঘরটিতে সমবেত হলেন। সাধনকালের দিব্যকান্তি তখন নেই। লালপেড়ে কাপড়, চটিজুতো পরা এক সহজ সরল মানুষ। অথচ তাঁকে ঘিরে আছে দিব্যতা।

সাধারণ মানুষ বলল—পরমহংস। অসার সংসার ছেড়ে যিনি সারগ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরকেই সব করে এক ঈশ্বরীয় মানুষ। গৃহী, ত্যাগী সকলেই এই জগতছাড়া ব্যক্তিটিকে দেখছেন। ওদিকে ত্যাগীশ্বর, ত্যাগসম্রাট, অন্যদিকে আর্ত-পীড়িত, দরিদ্র মানুষের জন্য দু-চোখে ধারা। এই অপূর্ব দেবমানবকে পেয়েছিলেন পার্ষদগণ—যাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল, তৎপর। খুঁজে ফিরছেন তেমন কারুকে যিনি ঈশ্বরের পথ বলে দেবেন, হাত ধরে নিয়ে যাবেন সেই আনন্দলোকে। তিনিই চাপরাশ দিলেন লোকশিক্ষার। ভগবান বুদ্ধের মতো দেশনা দিলেন—চরথ ভিখ্কবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়।

এবার আত্মসুখ নয়—বহুর সুখে সুখী, দুখে দুখী হওয়ার পাঠ নেওয়া। এ তো যুগেযুগেই অবতারপুরুষ শিক্ষা দিয়েছেন, তবু আমরা অনুসরণ করলাম না। এবার স্বামীজী তাই ইতিহাসের গতিবিধি জেনেই এগিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপী উদার ভাবকে রূপ দিতে। তার জন্য কম মূল্য দিতে হয়নি স্বদেশে বিদেশে।

ভারতের সিংহশাবককে চিনতে পারাও সহজ ছিল না। রাজার সঙ্গে থাকছেন রাজার মতো, দীনদুঃখীর কুটিরে কাটাচ্ছেন তাদেরই একজন হয়ে। বিদেশি শাসকদের সামনে তেজের মহিমায় উদ্দীপ্ত। স্বদেশবাসী দেখলে বিদেশের মাটিতে আবেগে বিহ্বল হয়ে তার চায়ের দোকানে বসেই প্রেমে আলাপ করছেন—যেন কতদিনের পরিচয়। স্বদেশে, বিদেশে মাথা উঁচু করে হাঁটছেন। ভারতবাসী নতশির নয়, মহাসম্পদের দাতা।

যে- নরেন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের ধন, নিজের হাতে তাঁর লোকশিক্ষার চাপরাশ ঘোষণা করে শ্রীরামকৃষ্ণ এঁকেছিলেন ময়ূরের ছবি। তখনি সেই গূঢ় কথার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়নি কারুর কাছে। নরেন্দ্রের অপূর্ব ব্যক্তিত্ব যে পেখমধরা ময়ূরের মতো বিশাল রূপ নেবে, ধীরে ধীরে তার আভাস পেলেন গুরুভাইরা। তাঁরা দেখলেন তাঁর হৃদয় জুড়ে দামামা বেজে উঠেছে : তথাকথিত ধর্ম কী তিনি জানেন না কিন্তু তাঁর হৃদয় খুব বেড়ে গেছে, তিনি অপরের দুঃখে ব্যথা বোধ করতে শিখেছেন। নরেন্দ্রের এই অভূতপূর্ব বিকাশপর্বের কথাই বোধকরি ময়ূর-অঙ্কনের রহস্য। তাঁর নিজেরই ভাষায়, তিনি কোনও দেশের, কোনও জাতির নন।

দেশ, জাতির ঊর্ধ্বে এক বিশ্বমানব বিবেকানন্দ বিকশিত। কোনও যুগেই কোনও অবতার-পার্ষদের মধ্যে আমরা দ্যুলোক-ভূলোক ব্যেপে এমন অদ্ভুত বিকাশ দেখিনি। সে-বিকাশের মধ্যে ময়ূরপেখমের চিত্রবিচিত্র শিল্প সুষমা। অখণ্ডের ঘর থেকে যেন এক বিপুল রঙের, জ্যোতির বিচ্ছুরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শক্তিধর তাঁকে আবাহন করে নামিয়েছিলেন খণ্ড চেতনার আবর্তে। সেখানেই গুরুসান্নিধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। আণবিক বোমা নয়, অসীম মানবিক ক্ষমতার নির্ঝর। মাঝে মাঝে নিজেই অনুভব করছেন শক্তির প্রাবল্যে ফেটে পড়বেন। বিবেকানন্দের হাড়, মজ্জা, শোণিত দিয়ে তৈরি হবে ভারতের উত্তরপুরুষ। তাঁর জন্ম শোনানোর জন্য নয়, হয়ে ওঠার জন্য।

ভারতের মাটিতেই জন্ম নেবে সেইসব তরুণ তরুর চারা—যারা স্বপ্ন দেখবে সত্যের, মহতের, বৃহতের, মহাব্যাপ্তির। ওই ময়ূর-কলাপের মতন যারা নিজেদের ধীরে ধীরে বিকশিত করবে। যে-পথ রচনা করেছেন বিশ্ব-বিবেকানন্দ সেই পথ ধরে তারা এগিয়ে যাবে, মুখে থাকবে তাঁর জয়ধ্বনি।

আমাদের এই নতুন উত্তরাধিকার রক্ষার সময় অনেকদিনই এসেছে। অতি কষ্টে পাওয়া আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন মানুষের মতো মানুষের অভাবে। মনুষ্যত্বের অবমাননায় বৃহত্তর জনগণের দেহ-মন কলুষিত। অমার্জিত ভাব ও ভাষার ব্যবহার বর্তমান সংস্কৃতিকে টেনে আনছে সভ্যতার নিম্নস্তরে।

স্বার্থসুখে উন্মত্ত এ-প্রজন্মের অধিকাংশই কঠিন সংগ্রামে উন্মুক্ত স্বাধীনতার আলোকিত দ্বারগুলি আবার রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

একটা অসংহত ও অসংযত পরিণাম আমাদের ফিরে পাওয়া মূল্যবোধ নির্মূল করে ভাবিকালের অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এরই মধ্যে বহু মানুষ স্বামীজীর পতাকা নিয়ে পথ খুঁজছেন, পথ তৈরি করছেন। স্বামীজীর ভাবের বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁর অনুগামীরা। এই একশো পঞ্চাশ বছরে যেন তারই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। মাটিতে বীজ বোনা যায় মাটি পাট করে প্রস্তুত করলে। কিন্তু মানুষের মনে মনে বীজ বুনে দেওয়া তার আগাছা পরিষ্কার করে—সহজসাধ্য নয়। বিদেশি ভাবনার আগাছাগুলি আজ আমাদের বর্তমান প্রজন্মের মনে এমন ছেয়ে গেছে যে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবনার চারাগুলির জন্মই কঠিন হয়ে পড়েছে। জাতি, সমাজ সংস্কারের চেয়ে নিজমনের সংস্কার করাই আজ প্রথম প্রয়োজন। আমরা কি স্বামীজীর ভাবে নিজেকে পরিবর্তনের জন্য তৈরি? নাকি, এখনও আমাদের বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে? আজকের লক্ষ্যহীন জীবনযাত্রায় আলোকিত স্তম্ভের মতন আমাদের সঙ্গেই তিনি রয়েছেন। সেদিকে এগিয়ে চলতে আজও আমাদের সংশয়ী চিত্ত দোলাচলে। ভারতবর্ষ কোনওকালেই মানুষের মনের ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁর নরেন্দ্রের ওপর কিছু চাপিয়ে দেননি। খোলা চোখে তাঁকে দেখতে শিখিয়েছেন জগৎরূপ দুঃস্বপ্নকে। সে-দুঃস্বপ্নকে ভাঙার মন্ত্রও দিয়েছেন। আজকের প্রজন্মকেও স্বামীজী নিজের চোখে দেখতে ও নিজের দেশের ভাইবোনকে আপনবোধে চিনতে বলেছেন। চেয়েছেন অখণ্ড ভারতবর্ষের নতুন মানুষ যাদের চোখে সাম্য-মৈত্রীর আলো। যারা বিদেশের ভোগ ও মাদকতা কাটিয়ে ত্যাগে-প্রেমে ভরা ভারতকে সেবা করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন—আমরা আশাও করি না, নিরাশও হই না—আমরা দৃঢ়নিষ্ঠ। আশা-নিরাশার মধ্যে না থেকে আমরা শুভকে ধরে অগ্রসর হব।

স্বামীজী আমাদের শক্তি, আমাদের প্রেরণা, আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য।